দৈনিক বাংলা

তারিখ 14 MAR 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

030

নিরুপায় অভিভাবক আর অসহায় শিশু

আমরা আধুনিক বাপ-মা সন্তানের কল্যাণ-কামনায় এতোই অধীর হয়ে পড়েছি যে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে তাকে জড়-পুতুল বানিয়ে ছাড়ছি।

বছরের শুরুতে নার্সারি, প্লে-গ্রুপ, প্রথম শ্রেণী—এসব ক্লাসের কচি-শিক্ষার্থীদের দিকে তাকালে অবস্থা কিছুটা আঁচ করা যায়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—ইউনিফর্ম-পরা ও ব্যাগের বইয়ে নুইয়ে পড়া শিশু সাতসকালে কষ্ট করুণ মুখে স্কুলে যায়। বেশির ভাগ সময়েই তাকে টানা হেঁচড়া করে স্কুলে নেয়া হয়। অনেক সময় ধমক-ধামক তো দিতেই হয়, এমনকি ক্ষেত্র-বিশেষে মারধোরও। ভোরে পথ চলারকালে অশ্রু ভরা অথবা কান্না-ভেজা কচি মুখ চোখে পড়াটা এখন স্বাভাবিক দৃশ্য।

প্রশ্ন জাগে—এমন হয় কেন? শিশুর প্রথম স্কুলে যাওয়া কেন এমন নিরানন্দের? এর জবাব মাত্র একটিই—বয়স না হতেই তাকে স্কুলে ভর্তি করানো।

বাংলা মাধ্যমে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ছয় বছর পুরো হতে হয়। বয়সের ওপর গুরুত্ব দেয়ার এ নিয়মটা অকারণ নয়। জন্মের পর থেকে শিশুর কাছে ঘর ও পরিবার-ই তার পৃথিবী; পারিবারিক সদস্য ও বিশেষ ভাবে জননীর সঙ্গে তার সম্পর্ক নিবিড়। চেনা আবর্তের বাইরে যাওয়ার জন্য যে বোধ ও বুদ্ধির দরকার, তার জন্য মনেরও কিছুটা পরিপক্কতা চাই। কিন্তু শিশুদের মনের বিষয়টি বিবেচনায় আনা সম্পর্কে আমরা উদাসীন।

এই উদাসীনতা দীর্ঘকালের। আশা করা যাচ্ছিল—আমাদের এ মানসিকতার রূপ বদলাবে। কিন্তু দিনকে দিন এ বাড়ছে। বোধ হয় কিছুটা নিরুপায় হয়েই।

স্কুলে ভর্তি যে আজকের দিনে কী কঠিন, তার বর্ণনার প্রয়োজন নেই। শিশুর মুখে ভাষা ফোটার সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবকের মনে ভাবনা জাগে—একে কোন স্কুলে দিই। কিভাবে দিই। এ চিন্তাই ক্রমে শিশুর বয়স তিন শেষ হতে না হতেই অভিভাবককে স্কুলে স্কুলে ছুটতে বাধ্য করে। অভিভাবক যতো শীগগীর পারেন, তাকে ভর্তি করাতে পেরে শান্তি পেতে চেষ্টা করেন।

স্কুলে ভর্তি-করানোর তীব্র অভিলাসের কাছে পরাস্ত হয় শিশুর মন ও বয়স। ছোট্ট মানুষ, মায়ের ওপরই যার পুরো ভর, তাকে কিনা ঘুম থেকে উঠেই ছাড়তে হয় তার চেনা মানুষ, আপন ঘর। অচেনা পরিবেশে দু'তিন ঘন্টা কিংবা তারও বেশি সময় কাটানো তার জন্য দুর্বিসহ। শিশু 'ভবিষ্যৎ' বোঝে না, কেন বা মা-কে ছেড়ে ক্লাসে বসে। পড়ালেখার উপকারিতা সম্পর্কে ধারণাই রাখে না—সে শুধু চায় তার মানুষদের। তাই সে মুখ ভার করে রাখে, মাথা ঝাঁকিয়ে থাকে—অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

মাকে অনেক সময় স্কুলে তার জন্য সময় নিয়ে বসে থাকতে হয়—দূর থেকে মা-কে দেখে শিশু ঘন্টাগুলো পার করে দেয়। টিফিনে ছুটে আসে জননীর কাছে। হাসি মুখে টিফিন খায়। এমনি করে প্রতিটি সূর্যোদয় শিশুর জন্য পরম যাতনার হয়ে দাঁড়ায়। এই যন্ত্রনা তার জন্য ভাষায় প্রকাশ করা কষ্ট।

এই বিষাদ সবাই মেনে নেয় না অনেকে বিদ্রোহী হয়। কিছুতেই ক্লাসে বসতে রাজী নয়, বই খাতা সব ফেলে ছুটে ছুটে পালায়। স্কুল কাঁপিত হয়, অভিভাবক বিব্রত বোধ করে শিশুর ওপর শোধ নেন—প্রকাশ্যে ভয় দেখান, সবার সামনেই শাসান, শাসন করেন। শিশু শঙ্কিত হয়ে থেকে অথবা চিৎকার করে কেঁদে প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু সবই বৃথা যায়—কেন না দূরদর্শী অভিভাবক চোখে সর্ষে ফুল দেখেন, এই ভর্তিটা ফসকে গেলে পরের বছর স্কুল আর কি পাবেন? তাই যেভাবেই হোক— শিশুকে বাধ্য করেনই করেন।

অনেকে বলেন—বিদেশে মানে উন্নত দেশে নার্সারি, তারও আগে প্লে-গ্রুপে এইটুকু টুকু বাচ্চারা পড়ে কি করে? থাকে কি করে মা ছেড়ে? এমন যাঁরা বলেন, তাঁরা পরিবেশের অসামঞ্জস্য এড়িয়ে যান। জন্মগ্রহণের পর শিশুকে সেখানে আমাদের মতন মায়ের বা পরিবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হয় না। দিনের অধিকাংশ সময় মা তার কাছেই থাকেন না—তার লালন-পালনের রীতি-নীতিই সম্পূর্ণ আলাদা। জন্মেই শিশু ভিন্ন বেবীকট পায়—কোনও অবস্থায়ই শিশুদের জন্য সেখানে মায়ের আঁচলের ছায়া পর্যন্ত নেই। সেখানে প্লে-গ্রুপে বরং শিশুমন প্রাণচাঞ্চল্য পায়। পায় সঙ্গী, খেলার উপকরণ। পড়াশোনার দিকে টেনে নেয়ার জন্যও রয়েছে চমৎকার সব উপাদান—খেলনা, ছবি, রঙিন বই, খোলা জায়গা, গান, খেলা আর অবাধ স্বাধীনতা। তাই অচেনা পরিবেশ খুব চট করে শিশু-মন আকর্ষণ করে—নীরস বই, শাদা দেয়াল, কালো বোর্ড, ঠেলাঠেলির বেঞ্চ ও নিস্পৃহ অভিব্যক্তি তাকে ভীত করে তোলে না।

আমাদের অবস্থা শিশু-মনের জন্য মোটেও অনুকূল নয়। এখানে বইয়ের পৃষ্ঠা অল্পে ছেঁড়ে— ছিঁড়লে শিশুর ভাগ্যে কিলচড় জোটে। এখানে শিশু জোরে হাসলে, সশব্দে দৌড়ুলে থামানো হয় চোখ রাঙিয়ে। দমবন্ধ শ্রেণীকক্ষে বেচারা শিশুমন ভয়ে ভাবনায় চুপসে যায়—তার মন তখন সার্বক্ষণিক সঙ্গী ও পরম-নির্ভর জননীকে অসহায়ের মত খুঁজে বেড়ায়।

মানুষ অভ্যাসের দাস। শিশু-মনও অবশ্যই। এক সময় শিশু অভ্যস্ত হয়েই যায়। মন বসলে ভালো না-বসলে সে স্কুল পালায়, ক্লাস ফাঁকি দেয়। ভাগ্য ভালো হলে তাকে শোধরানো যায়, নইলে সে চিরতরে পথচ্যুত হয়।

মনে হয়, এ সমাজটাই সব বয়সের শিক্ষার্থীর জন্য বৈরী। শৈশবের বাধ্য-বাধকতার সঙ্গে যোগ হয় কৈশোরের নীরস পাঠ্য সূচী ও পঠিত বিষয়ের আধিক্য, ভালো মানের বিদ্যাপীঠের অভাব ও সংবেদনশীল শিক্ষকের সংকট। শিক্ষার পুরো বিষয়টি অতিমাত্রায় অর্থ-নির্ভর হয়ে পড়ার ফলে অসচ্ছল অভিভাবকের সন্তান মেধাবী হয়েও অনাদরে থাকে আর যোগ্যতা সত্ত্বেও অ-ভালো ফল লাভ করে। এমনি করে মনের গহনে ও কার্যকলাপে বৈকল্য ও নৈরাজ্য বাসা বাঁধছে।

এর চূড়ান্ত রূপ দেখা দেয় শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে। ঈপ্সিত ক্লাসে ভর্তি হতে না-পেরে উদোর পিন্ডি বুধোর মতো ঘাড়ে বহন করে অল্প বছরের পর বছর খুইয়ে তরুণ-মন দেউলে। যারা পারে, তারা বিদেশে চলে যায়। যারা পারে না, তারা মনমরা হয়ে প্রহর গোনে। বয়সোচিত উদ্যম, সামর্থ্য ও স্বপ্ন নিয়ে তারা ব্যর্থ হয়—ঘরের কোণে বসে কাল কাটায়।

ছাত্র-জীবনের সর্বস্তরে এমন অসহায়তা সত্যি তুলনাহীন। আগামী দিনের ভবিষ্যৎ 'ছাত্রদের' দশা আজ সর্ব অর্থেই সঙ্গীন।

শৈশব থেকে না-বুঝে তার যে অশ্রু ক্ষয় শুরু হয়, সেই অশ্রুই সব স্তরগুলো ভাসিয়ে তারুণ্যেও তার অবস্থা দুর্বিষহ করে তোলে আর জীবনটাকে নিক্ষিপ্ত করে অনিশ্চয়তার মধ্যে।

আধুনিকতার নামে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সর্বস্তরে ব্যর্থ করে তাদের অসার পদার্থে পরিণত করছি আর নিজেদের মনের প্রাধান্য দিয়ে তাদের মন-মেধাকে অবমানিত করছি। এ আসলে আমাদেরই আত্মপ্রবঞ্চনা বইকি!

—হোসনে আরা শাহেদ